

Folk Deities of Bengal

Dr. Srabani Sen

Associate Professor, Department of Music, Tarakeswar Degree College

e-mail-dr.ssen8693 @gmail.com Mobile no- 6290855102

Bengal's folk deities are a vibrant part of the region's religious landscape, reflecting a blend of indigenous beliefs and Hindu traditions. Folk deities like Manasa, Chandi, Dharma Thakur, Bonbibbi, Sitala, Oladebi, Dakshin Roy are most popular worshipped in rural Bengal. Some folk deities and their worship practices show a blend of Hindu, Islamic and tribal traditions reflecting the divers cultural landscape of Bengal.

বাংলার লৌকিক দেবতা

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। লৌকিক দেবদেবীগণ পুরোপুরিভাবেই লোকসমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। লোকনাট্য, লোকনৃত্য এবং লোকসংগীতের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন এই দেবদেবীরা। পৌরাণিকতার আবরণ ছিন্ন করে লৌকিক দেবদেবীগণ জনমানবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছেন। আদিম মানুষের অনিশ্চিত জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগব্যাদি, খাদ্য সংগ্রহের অনিশ্চয়তার কারণে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা। মূলত গ্রামীণ লোকমানসে তাঁরা পূজিত হন নানা ধরনের লোকবিশ্বাস থেকে। পারিবারিক ও সামাজিক নানা সমস্যা ও জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেক সময় লৌকিক দেবদেবীরা পূজিত হন। বাংলা বিভিন্ন স্থানে এইরকম অনেক দেবদেবী পূজা পেয়ে থাকেন, যাদের নাম শাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ নেই। লৌকিক দেবদেবীদের সঙ্গে লোকউৎসবও অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত। এই সমস্ত উৎসবের মূলে রয়েছে ধর্মীয় সংস্কার, রয়েছে পৃথক পৃথক চিন্তাধারার মানুষের বিশ্বাস--অবিশ্বাস, আচার--আচরণ। গ্রাম বাংলায় কিছু ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এইসব লোকদেব-দেবীরা এখনও স্বমহিমায় বিরাজ করছেন। এই সমস্ত দেবদেবীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পূজা পার্বণ উপলক্ষ্যে মেলা, লোকসংগীত আজও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধর্মাচার পালনের জন্য আচার, অনুষ্ঠান হল পূজা - দেবতার কাছে প্রার্থনা। লোক সমাজ অনিষ্টকারী শক্তির দেবতাদের তুষ্ট করার উপায় স্বরূপ পূজাকেই ভরসা করে। দেবদেবীর অধিকাংশ স্বাভাবিক বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি এবং উৎসবের বিচারে এদের উদ্ভব লোকসমাজের সাধারণ স্তর থেকেই। পরবর্তীকালে মার্জিত রূপে শাস্ত্রীয় দেবদেবীর আবির্ভাব হয়।

বাংলায় অনেক গ্রাম্য দেবদেবী রয়েছে, যাদের জন্ম হয়েছিল বহু প্রাচীনকালে। এদের অস্তিত্ব কোন পুরান বা শাস্ত্রে নেই, দেশের সাহিত্য বা ক্ষেত্রসমীক্ষা করে এদের পাওয়া গেছে। তাই বাংলার লোকধর্ম যে মূলত লৌকিক প্রাণার্থ তা বলা যায়। লোকধর্ম দেবদেবীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না। লোকসমাজের শুভাশুভ চিন্তা থেকে যে সর্বজন-গ্রাহ্যতা, বিশ্বাস গড়ে ওঠে, তাই সর্বসাধারণের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তির জন্ম দেয়। কোন বিশ্বাস হয়তো বিশেষ উদ্দেশ্য বা কামনা অবলম্বন করে জন্ম নিয়েছিল। তা থেকেই বিশেষ দেবতা বা দেবীর সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রসঙ্গে বলা যায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক রূপে আদিম যুগে দেবতার কল্পনা করা হতো। গ্রাম থানে দেবদেবী, আধিব্যাধি নিয়ামক দেবদেবী, অবতার রূপে স্বীকৃত সাধুসন্ত, অনিষ্টকারী প্রেতাছা, বৃক্ষ সাপ ও নানা প্রাণীর পূজা লোকসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত। আবার মনুষ্য সমাজে নারী-দেবতার পূজা বা মাতৃকা পূজার প্রচলন যুগ-যুগান্ত ধরে চলে আসছে। প্রাচীনকালের পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে পশুপাখি ও মাতৃমূর্তি সংখ্যায় বেশি। বিভিন্ন কামনা বাসনাকে অবলম্বন করে বিশ্বাস ও আচারের পরিণতি রূপে দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটেছে। প্রাচীনকালে পুরাকথায় যেসব দেবদেবী কল্পনা সূত্রে আবদ্ধ ছিল, তারা কালক্রমে পুরাণ ও শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়ে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এমনকি প্রাচীন বাংলার নানা প্রান্তে যেসব আদিবাসী, বৌদ্ধ, জৈন অন্যান্য আর্ষেতর ভাবধারার অস্তিত্ব ছিল - তাদের বিশ্বাস ও সংস্কারের জগতেও ছিল নানা দেবদেবীর অধিষ্ঠান। মনে করা হয় সেকালের আদিম বিশ্বাস ও বাঁধানিষেধ থেকেই বর্তমানের সর্বজনীন লোকমানস এবং লোকদেবদেবীর রূপকল্পনা হয়েছে।

বাংলার চন্ডী, মনসা, শীতলা, বনবিবি, ষষ্ঠী ইত্যাদি দেবীর আবির্ভাব এইভাবেই হয়েছিল। আমরা জানি, প্রাকৃতিক শক্তির অলৌকিকতায় অভিভূত হয়ে তার রূপ কল্পনা করা হয়। ক্রমে তা যখন দার্শনিক বৃত্তি লাভ করে, লোকসমাজে প্রচারিত হয় তখন ধর্ম নাম পায়। সমাজের নিচু তলার মানুষ সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তার পরিবর্তে নিজেদের ক্ষুদ্র সমাজ-পরিবেশে প্রয়োজনমতো দেবদেবীর সৃষ্টি করে নেয়। আত্মশক্তি সংঘত করে আত্মবিশ্বাসে অটল থাকার সহায়ক রূপেই দেব দেবীর উপযোগিতা। তাই পেশা ও অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্ব দেখা যায়। তাই যে কোন উর্বরতা বৃদ্ধির কামনা থেকে এসব বিশ্বাস জন্মেছিল তা থেকে লোকসমাজে অজস্র লিঙ্গ প্রতীক ও দেবদেবীর আবির্ভাব হয়েছিল। নারী জীবনের পূর্ণতা, ধর্মীয় সংস্কার এবং সামাজিক ও মর্যাদার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিঃসন্তান নারী-পুরুষ অনুষ্ঠান পালন করে, কুমারী মেয়েরা নানারকম ব্রত ও পূজা করে, সন্তান কামনা করে বাংলার আরও অনেক দেবদেবীর পূজা করা হয়। কার্তিক মাসে নিঃসন্তান দম্পতি কার্তিক ব্রত পালন করে। ষষ্ঠী দেবী বাংলার নারীদের পূজা পান। নানা নাম ও পরিচয়ের ষষ্ঠীদেবী বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, যেমন -শীতল ষষ্ঠী, গাছ ষষ্ঠী নীল ষষ্ঠী ইত্যাদি সন্তান দায়ী দেবী রূপে পরিচিত। অরণ্য ষষ্ঠী, জামাইষষ্ঠী জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে পালন করা হয়। কোন কোন জায়গায় বিয়ের সময় ষষ্ঠী পূজা আচার রূপে প্রচলিত। মঙ্গল চন্ডীকেও মেয়েরা সন্তানদায়িনী রূপে পূজা করে থাকেন। ধর্ম ঠাকুরও শিবের বিবর্তিত রূপ বলে মনে করা হয় - ইনিও প্রজননের দেবতা। নিঃসন্তান, সন্তানবতী সকলেই ধর্ম ঠাকুরের কৃপা লাভ করতে উৎসুক। লোকবিশ্বাস সূর্যঠাকুরের প্রতীক ধর্মঠাকুর। সর্পদেবী মনসা ও সন্তান কামনায় পূজিত হন। বাংলায় বিবাহের পূর্বে, আসামে নারীর বক্ষ্যাতনের জন্য মনসা দেবীরপে পূজিত হন। দক্ষিণ ভারতেও সন্তান কামনায় মনসা পূজার প্রচলন আছে। কোন কোন স্থানে মনসা পূজার সঙ্গে মেয়েদের কৃত্রিম বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়। সত্যপীর, শীতলা, পঞ্চগনন, বর্গভীমা, রক্ষিণী স্থানিক দেব-দেবীর কৃপায় সন্তান লাভ হয় বলেও লোকবিশ্বাস।

আদিম জীবনের সমস্যা ও সংকটের আবর্তে নিরাপত্তাহীন অনিশ্চিত অবস্থায় মানুষ তার মনোবল অটুট রাখার জন্য, সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য, জীবনের কামনা পূরণ ও সংকট থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য জীবজন্তু, গাছপালা, নদীনালা ও অন্যান্য অশুভ শক্তিকেও সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছে। এইভাবে এসেছে প্রথম ব্রত ও তারপর পূজা। প্রথম দিকে আচার-অনুষ্ঠানগুলো সমবেত ভাবে হলেও পরবর্তীকালে পারিবারিক স্তরে পৌঁছেছে। বাংলার লোকসমাজে এখনও বৃক্ষপূজা প্রচলিত আছে। বৃক্ষপূজা মানুষের ধর্মবিশ্বাসের একটা বড় ধরার সৃষ্টি করেছে। বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি কতগুলো সামাজিক উপযোগিতা সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের দাবিও মেটায়। ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে বৃক্ষ পূজা সম্পর্ক থাকায় মানুষ পূর্ণ অর্জনের জন্য অশ্বত্থ, বট ইত্যাদি বনস্পতির পূজা করে। এই গাছগুলি পুত্রকামনায় মানতের লক্ষ্য স্থলও হয়ে ওঠে। এখনো পর্যন্ত এই সব বিশ্বাস অবাধে অনুসৃত হয়ে চলেছে। মেয়েদের মধ্যে এই পূজার প্রচলন বেশি। আদিবাসী লোদা, ভূমিজ সাঁওতাল, ওরাওঁ ইত্যাদি মানুষেরা বোঙ্গা, বড়াম, সিনি ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করে গাছের তলায় বা বোঁপের পাশে। বকুল, তুলসী, অশোক, পদ্ম, দুর্বা ইত্যাদি পুরাণের যুগ থেকে পূজিত হয়ে আসছে। কিন্তু আদিম যুগে নিম, অশ্বত্থ, বেল, কাঁঠাল ইত্যাদি বৃক্ষ পূজিত হত। এই গাছগুলি আজও শাস্ত্র ও পুরাণের নানা দেবদেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্ররূপেই পূজা পেয়ে থাকে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধ মহাযান, বজ্রযান ইত্যাদি নানা শাখায় দেবদেবীর উপাসনা নিম্নবর্ণের বাঙালি সমাজে সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছিল। বজ্রযানী দেবদেবীর মধ্যে মরীচি, পর্ণশবরী, হারীতী ও চুন্ডাই প্রধান। ধারণা করা হয় চুন্ডাই পরবর্তীকালে চন্ডীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তারাদেবী পর্ণশবরীর অনুচর, তিনি পরে দশমহাবিদ্যার অংশ ও শেষ পর্যন্ত কালীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। বাংলায় সর্বত্র পূজিত ষষ্ঠী দেবীর বৌদ্ধ প্রতিরূপ হলেন হারীতী। ইনি ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠীদেবীতে রূপান্তরিত হলেও এখনো লোকধারায় পূর্ণরূপে টিকে আছেন। শিব লিঙ্গপ্রতীক ও পশুদের দেবতার রূপে অনার্যধারা থেকে এলেও পরে সর্বজনীন স্বীকৃতির মাধ্যমে সকলের দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এইভাবে বিভিন্ন দেব দেবীর আবির্ভাবের নেপথ্যে একটা ইতিহাস রয়েছে।

লৌকিক দেবতা হিসেবে ধর্ম ঠাকুরের জনপ্রিয়তা রয়েছে। জেলে, বাগদি, বুনো, মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মানুষজন পৌষ সংক্রান্তির দিন জিউলি গাছের উপর বিচুলি চাপিয়ে ধর্ম ঠাকুরের পূজো করেন।

বাংলার নারী সমাজের ষষ্ঠীদেবীর পূজার প্রচলন সর্বাধিক। ষষ্ঠীদেবী মূলত সন্তানদায়িনী ও সন্তান রক্ষয়িত্রী দেবীরূপে সুপ্রসিদ্ধা। শিশুদের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠী পূজার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। বছরের বিভিন্ন সময়ে মায়েরা তাদের সন্তানের মঙ্গলের জন্য ষষ্ঠীব্রত করে থাকেন। যেমন - অরণ্য ষষ্ঠী, দুর্গাষষ্ঠী, শীতলাষষ্ঠী, অশোকষষ্ঠী, নীলষষ্ঠী। শিশুদের মঙ্গল কামনার জন্য মায়েরাই এই পূজা করে থাকে। আজও বাংলার গুরুাষষ্ঠীতে শোনা যায়-

“ নিশি শেষে চৈত্র মাসে বুধবার দিনে।

গীত করিবারে দেবী মহিলা স্বপনে।।

ব্যাধি সংকটে মোর তনয়া পীড়িত।

তার রক্ষা হেতু মোরে করাইল গীত।।

তনয়া রাখিলা মোরে দিয়া পদচ্ছায়া

এমনি রাখিব আমা শুনো মহামায়া।” ১

দেবী চন্ডী একাধিক নামে পূজিত হন। যেমন- কুলুই চন্ডী, শুভচন্ডী, উড়নচন্ডী, নাটাই চন্ডী, ওলাইচন্ডী, বনচন্ডী, মঙ্গল চন্ডী, লৌকিক দেবী হিসেবে নদীয়া জেলাতে সমারোহে পূজিত হন। কিংবদন্তি অনুসারে শ্রীমন্ত সদাগর

বৈশাখী পূর্ণিমা দিন বটবৃক্ষ মূলে দেবীকে স্থাপন করেন। এই স্থানে প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ওলাইচণ্ডীর পূজো এবং তাকে কেন্দ্র করে জনসমাগম ঘটে। যেমন-

“বৈশাখেতে পূর্ণিমায় কত সমারোহ
হইত এ জনপদে, - সে সুখ বিরহ
এবে ঘটয়াছে হয়! কত দূর হতে
আসিত অসংখ্য লোক, সম্বতে সম্বতে
দেখিতে চন্ডীর পূজা! প্রতি ঘরে ঘরে
কুটুম্ব বান্ধবগণ, আসি থরে থরে
প্রবেশিত অগণন।”২

পঞ্চগনন বা পঞ্চগনন্দ অন্যতম লৌকিক দেবতা। লোকবিশ্বাস মতে ইনি শিবের এক রূপ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্তৃত অঞ্চলে এই দেবতা পূজিত হন। এই লৌকিক দেবতা শস্যদাতা এবং সন্তান দাতা বলে জনপ্রিয়। আবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বেশ কিছু অঞ্চলে ইনি ‘বাবাঠাকুর’ নামেও পরিচিত। ঐতিহাসিকদের মতে রাঢ় বাংলার অন্যতম প্রাচীন লৌকিক দেবতা ধর্ম ঠাকুর এই পঞ্চগনন রূপের মাধ্যমে আর্যদেবতা শিবের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

বসন্ত রোগ মুক্তির জন্য শীতলা লৌকিকদেবীর পূজা রানাঘাট, চাকদহ, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। লোক বিশ্বাসে শীতলা হচ্ছে বসন্ত রোগ নিরাময়ের দেবী। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার প্রায় প্রায় সর্বত্র শীতলাদেবীর মন্দির আছে। তিনি অন্যতম লৌকিক দেবী। ‘মায়ের দয়া’ নামে পরিচিত। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে শীতলা দেবীকে পূজো দিয়ে তুষ্ট করে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আরোগ্য কামনা করা গ্রামীণ হিন্দু সমাজের প্রধান রীতি। গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু জায়গায় টানা তিন- চার দিন শীতলা মায়ের আরাধনা হয়।

করম পূজা হলো মনসা পূজারই নামান্তর। মুণ্ডাজনজাতির মধ্যে করম পূজা খুবই জনপ্রিয়। করম গাছের ডাল পুঁতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অরক্ষনের মাধ্যমে প্রতিটি ঘরে পালিত হয় মনসা পূজা। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এই পূজো হয়। অনেকে পারিবারিক গৃহদেবীরূপে মনসার প্রতীক ঘট অথবা মূর্তি প্রতিষ্ঠা পুরুষানুক্রমে করে আসছেন। বার্ষিক মনসা পূজাকে চলিত কথায় বলা হয় রান্না পূজা, আগের দিন রাতে নানা রকম পদ, পিঠে পুলি রান্না করা হয় এবং পরের দিন উনুনের সামনে ফণীমনসা ডাল স্থাপন করে এই পূজা করা হয়।

গঙ্গা পূজো একটি লৌকিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। গঙ্গা পূজা লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই দিন গঙ্গাস্নান করলে যাবতীয় পাপ স্বলনের পুণ্য মেলে - এই বিশ্বাস লোকসমাজে প্রচলিত। জৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে দশহারা পূজা হয়। এই দিন পুণ্যের কামনায় মানুষজন গঙ্গাস্নান করে। দশহারার দিন মনসা পূজো করে সর্পের দেবী মনসাকেও তুষ্ট করা হয়।

শনি ঠাকুরের পূজা বাংলার প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। শনি দীর্ঘায়ু, দুঃখ, মৃত্যু প্রভৃতির নিয়ামক। মধ্যযুগীয় গ্রন্থ মতে শনি হলেন একজন দেবতা, যিনি দুর্ভাগ্যের অশুভ বাহক হিসেবে বিবেচিত হন। মূলত শনি ঠাকুরের প্রতি শনিবার পালন করে মেয়েরা।

‘বিপত্তারিণী’ গ্রামাঞ্চলে পূজিত সর্বজনবিদিত এক অন্যতম প্রধান লৌকিক দেবতা। আষাঢ় মাসের রথ থেকে উল্টোরথের মধ্যে মঙ্গলবারে ও শনিবারে হিন্দু মহিলারা বিপত্তারিণী ব্রত করে থাকেন। গ্রামাঞ্চলে বিপত্তারিণী পূজো দুদিন ধরে হয়, কোথাও চার দিন ধরে হয়। প্রথা অনুসারে হাতে একগুচ্ছ লাল সুতা ও দুর্বাঘাস বাঁধা হয়।

“অষ্টচাল অষ্টদূর্বা কলস পাত্র ধরে

ইত কথা এক মনে শূন্য প্রাণ ভরে।”৩

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রসিদ্ধ লোকদেবতা বাবা বামনগাজি। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বামনগাজি রোগব্যাদির দেবতা। মন্দিরের মন্ত্রপুত তেলপড়া ব্যবহারে অনেক রোগ নিরাময় হয়। বাবা বামনগাজিকে নিয়ে লোক প্রচলিত নানা ছড়া পাওয়া যায় -

“সর্বচিন্তা পরিহারী বামন গাজীরে স্মরি

নিয়মিত জলপড়া করহ সেবন,

অচিরে জানিবে তবে কোন রোগ নাহি রবে

তাজপুরে গিয়া পুনঃ দাও হে পূজন।”৪

ওলাবিবি বা বিবিমা অন্যতম লৌকিক দেবী। ওলাদেবী ওলাওঠা বা কলেরা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি লাইচণ্ডী নামেও পরিচিত। ওলাদেবীকে অসাম্প্রদায়িকভাবে, অর্থাৎ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পূজা করা হয়। হিন্দু প্রধান অঞ্চলে আকৃতি লক্ষ্মী বা সরস্বতীর মত, গায়ের রং হলুদ বর্ণ। পরনে সাধারণত নীল শাড়ি। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে আকৃতি ও পোশাক অন্য ধরনের হয়ে থাকে। পরনে পিরান, পাজামা, টুপি, ওড়না। ওলাবিবির পূজো এককভাবে হলেও অন্য ছ’জন-ঝোলাবিবি, চাঁদবিবি, বহেড়াবিবি, ঝেটুনিবিবি ও আসানবিবির পূজো হয়। এদের মধ্যে ওলাবিবিই প্রধান।

বনবিবির পূজা সবচেয়ে বেশি হয় সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায়। মূলত জঙ্গলের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নিবিড় তারাই এই পূজা করে থাকে। তাই জেলে বা কাঠুরীদের মধ্যে এই পূজা সর্বাধিক প্রচলিত। জঙ্গলে যাওয়ার আগে বা জঙ্গল থেকে ফিরে এসে এই পূজা করা হয়। এই পূজাতে সকলের অবাধ অধিকার। মা বনবিবি জঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বাঘকে বাহন করে নিজে তার পৃষ্ঠে অবতীর্ণ। বাঘের ভয় থেকে বনবিবির উদ্ভব হয়েছে। সুন্দরবনের হিংস্র প্রাণী মানুষকে বাঘকে বশে আনার জন্য মায়ের সঙ্গে তারও পূজো করা হয়। গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বনবিবির থান আছে। হিন্দুওমুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষ বনবিবির স্থানে মানত করে। মানত পূর্ণ হলে মাটির ঘোড়া, পুতুল দেওয়ার পাশাপাশি মুরগি বলি দেওয়ার রীতিও লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কিছু গ্রামাঞ্চলে বনবিবির পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

লৌকিক দেবতা রূপে মল্লিকঠাকুরের বহুল জনপ্রিয়তা আছে। মল্লিক ঠাকুরের থানে বড়ো বড়ো অশ্বখ ও বটগাছ পাশাপাশি অবস্থান করে। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের আট তারিখে অম্বাবুটির দ্বিতীয় দিনে মল্লিক ঠাকুরের বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে মেলাটিতে চাকদহ এলাকার পাশাপাশি দূরদুরান্ত থেকে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করে।

এছাড়াও সুন্দরবন অঞ্চলে এক বিশেষ দেবতা পূজিত হন, তিনি দক্ষিণ রায়। তাকে পশু ও দানবের নিয়ন্ত্রক বলে মনে করা হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের লোকদেবতা দক্ষিণরায়কে সবাই জানে ভাটি অঞ্চলের অধিপতি হিসেবে। সুন্দরবনের অধিবাসীরা মাছ ধরা বা মধু আহরণের মত কাজে যাওয়ার আগে দক্ষিণরায়ের আরাধনা করে। কেউ কেউ মাথার পিছনে দক্ষিণ রায়ের মুখোশ পরে জঙ্গলে ঢোকে। কালুরাও কুমিরের দেবতা হিসেবে পূজিত হন। এরকমই আর এক দেবতা লৌকিক দেবতা আটেশ্বর, যিনি অরণ্যরক্ষক ও পশুরক্ষক দেবতা হিসেবে সুন্দরবন অঞ্চলের লোকদের কাছে পূজিত হন।

সুন্দরবন অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে চারজন লৌকিক দেবতা হলেন দক্ষিণ রায়, ধনাই বনিক, মনাই বনিক ও বড় খাঁ গাজী। প্রথমজন দক্ষিণরাজ যিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন পরবর্তীকালে লোকদেবীতে পরিণত হন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন সুন্দরবন এলাকার মাছ, কাঠ ও মধুর ব্যবসা সবথেকে বড়ো ও ধনী ব্যবসায়ী। চতুর্থ জন হলেন বড় খাঁ গাজী। এই গাজীও বাঘের দেবতা। তিনি পায়জামা পিরান পরিহিত ঘোড়াওয়ার যোদ্ধা। কিছু অঞ্চলে এনাকে লোকদেবতা হিসেবে পূজা করা হয়। এলাকায় জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, স্থানীয় হিন্দুদের জোর করে ভয় দেখিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে গিয়ে বহুবার এলাকার দেবতা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বিরোধ হয় এবং তার যুদ্ধে পরিণত হয়। যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে দক্ষিণরায় পরিণত হন লৌকিক দেবতায়।

খেদাই ঠাকুর জনপ্রিয় একটি লৌকিক দেবতা। সর্পদেবী মনসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে খেদাই ঠাকুরকে পূজো করা হয়। সর্পভীতি থেকেই এই লৌকিক দেবতার উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। সমগ্র চাকদহ এলাকা জুড়ে এই দেবতার পূজা করা হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর সংলগ্ন ধপধপি গ্রামের প্রতিষ্ঠিত লৌকিক দেবতা দক্ষিণেশ্বর। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী তিনি সাক্ষাৎ ধন্যন্তরি। এমন কোন রোগ নেই যে তার কৃপায় সারে না। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণ রায়ের ধরবিহীন মূর্তি পূজো হয় যা বারাঠাকুর নামে পরিচিত। গাছের তলায় মূর্তি বসিয়ে পূজো করা হয়। ফলমূল্য নৈবিদ্যের সঙ্গে কাঁকড়া, শোল মাছ দিয়ে বারা ঠাকুরের পূজা করা হয়। সুন্দরবনের দক্ষিণ রায় মিশে গেছে মহাদেব শিবের সঙ্গে, নাম হয়েছে দক্ষিণেশ্বর।

প্রাচীনকাল থেকে বৈদিক দেবদেবীর পাশাপাশি আঞ্চলিক লৌকিক দেবদেবীগণ দৈনন্দিন জীবনের চলার পথে দুঃখে-সুখে, উৎসবে-আনন্দে, রোগে-শোকে ধারাবাহিকভাবে পূজিত হয়ে আসছেন। বাংলার লোকসমাজে আঞ্চলিকতা, ধর্মবিশ্বাস, লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাসে আজও এইসব লোকদেবদেবীদের গ্রহণযোগ্যতা, সর্বজন-গ্রাহ্যতা সমভাবে বহমান।

তথ্যসূত্র

- ১। বাংলার লোকসংস্কৃতি- পৃঃ-৮৫
- ২। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য- পৃঃ-৬৮
- ৩। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ -পৃঃ-৪৬
- ৪। লোকঐতিহ্যের দর্পণে- পৃঃ-৫২

সহায়ক গ্রন্থ

- ১। বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ - বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ কলকাতা, ১৯৮৭
- ২। ভট্টাচার্য আশুতোষ - বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশানাল বুকট্রাস্ট, নয়াদিল্লি
- ৩। ভৌমিক প্রবোধকুমার-বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি, আনন্দপাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা
- ৪। সেনগুপ্ত পল্লব - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ
- ৫। বর্ধন মণি - বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য
- ৬। মিত্র হীরেন্দ্রনাথ - বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা

৭। মজুমদার মানস – লোকঐতিহ্যের দর্পণে